

Journal of Kolkata Society for Asian Studies: Vol 11. No. 1, June 2025

Sāmagāna and Indian Music: A Discourse

Didhiti Biswas

Sāmagāna and Indian Music: A Discourse*

Didhiti Biswas

Abstract

Vedic *Sāmagāna* is the document of the earliest evidence of Indian music. This *gāna* was essentially associated with the Vedic rituals and was used to be sung in a specific way as prescribed in the Vedic religious texts. The rigid religious prescription imposed on the presentation of these *gānas* and the gradual Brahmanic discriminatory attitude towards the singers and listeners initiated the introduction of another form of music i.e . Gāndharva. This new form could be practised by all irrespective of the cast and creed and its features have been elaborately documented in Bharata's Nāṭyaśāstra. Later Maṭaṅga's Bṛhaddeśi recorded two varieties of musical systems *mārga* and *deśi*. *Deśi* gradually gained popularity among people and at the time of Śārṅgadeva, *deśi* became the main stream music. This music while coming in contact with Persian music introduced by Amir Khusrou was moulded in a new form of music in North India. The music in South India remained more or less same as it had less impact of Islamic culture on it. This gave rise to two systems of Indian music North Indian and Karnatakī. Both of them evolved from the *deśi* music and do not owe to *Sāmagāna* for their origin. The Vedic *sāmagāna* remained confined in the religious sector without any modification. Some characteristics of this *gān* however, bear the influence of the traditional old popular music of common people in it. The sources however, are no more traceable due to the absence of systematic records though their legacy can be perceived indirectly. So *sāmagāna* remains as the earliest evidence of documented Indian music.

Key words: *sāmagāna, Samaveda, stobha, mantra, Bharata, Matanga, Śārṅgadeva*

*Professor Karunasindhu Das Endowment Lecture delivered on 9th September 2024 in Department of Sanskrit, Jadavpur University, organized by Kolkata Society for Asian Studies

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের অনুসন্ধানে বৈদিক সভ্যতা ও সংস্কৃতির ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। যে কোন সমাজ-সংস্কৃতির আলোচনায় শিল্প সঙ্গীতের আলোচনা অনিবার্যভাবেই আসবে। বৈদিক সংস্কৃতিও তার ব্যতিক্রম নয়। বৈদিক সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেই যুগের সংগীত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ছিল মানুষের এক স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ। আর তার থেকেই সঙ্গীত চর্চার শুরু। ভারতবর্ষের বিশেষ গৌরব যে তিন হাজার বছরের পুরনো এক সঙ্গীতধারার উত্তরাধিকার সে বহন করছে এবং সেই ধারা আজও চর্চিত হচ্ছে সীমিত গণ্ডির মধ্যে। এই সঙ্গীত বেদের যুগের এবং এর গানরূপটি সামগান নামে পরিচিত। বর্তমান ভারতীয় সঙ্গীত এক স্বতন্ত্রধারায় প্রচলিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে আজ সমাদৃত। বৈদিক সামগানের পরিচয় সহ সামগান থেকে বর্তমান ভারতীয় সংগীতের যাত্রাপথের এক সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হবে এই আলোচনায়।

সঙ্গীত শব্দটি বৈদিক গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু গীত, বাদ্য ও নৃত্যকে শিল্প বলে অভিহিত করা হয়েছে কৌষীতকি বা শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণে। এখানে বলা হয়েছে- ত্রিবৃদ্ বৈ শিল্পং নৃত্যং গীতং বাদিতমিতি^১। শিল্প শব্দটির উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণেও পাওয়া যায়। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণে শিল্প শুধু নৃত্যগীতাদির মধ্যে আবদ্ধ নয়, সেখানে শিল্পশব্দটির ব্যাপ্তি বেশি। শিল্প শব্দের ব্যাখ্যায় সায়ণাচার্য বলেছেন – শিল্পশব্দশাস্ত্র্যকরং কর্ম ক্রতে। শিল্প বলতে বুঝায় আশ্চর্যকর, প্রীতিজনক বা মনোজ্ঞ কর্ম। শিল্প দুই প্রকার, দেবশিল্প ও মনুষ্যকৃত শিল্প। দেবশিল্প অর্থাৎ দৈবশিল্প যা দেবতাদের প্রীতি উৎপাদন করে এবং দেবশিল্পের অনুকরণে মনুষ্যকৃত শিল্পকর্ম যা মানুষের হৃদয়গ্রাহী হয় – দেবশিল্পান্যেতেষাং বৈ শিল্পানামনুকৃতীহ শিল্পমধিগম্যতে য এবং বেদ। দেবশিল্পের অনুকরণে মানুষ মাটি, কাঠ, ধাতু, তন্তু প্রভৃতি দিয়ে হাতি, দর্পণ, বস্ত্র, স্বর্ণ অলঙ্কার, রথ প্রভৃতি যা কিছু তৈরী করে তা মনুষ্যশিল্প। এই শিল্পতত্ত্ব যিনি জানেন তিনিই শিল্পে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন – শিল্পং হান্মিন্নধিগম্যতে য এবং বেদ। শুধু তাই নয় শিল্প আত্মার সংস্কার সাধন করে – শিল্পের দ্বারা আত্মা পরিশীলিত হয়। বৈদিক ঋষিদের এই শিল্পভাবনা খুব বিস্তারিত না হলেও সুচিন্তিত ও স্বচ্ছ। এই চিন্তাকে একটু প্রসারিত করে আমরা ভাবতে পারি যে দেবসৃষ্ট এই জগৎ-ও একটি চমৎকার শিল্পকর্ম বলে ঋষিরা মনে করতেন।

বৈদিক সংগীতের আলোচনা ছাড়া বৈদিক সংস্কৃতির আলোচনা যেমন সম্পূর্ণতা পায় না, সেইরকম ভারতীয় সংগীতের মূল অন্বেষণেও বৈদিক সংগীতের অনুসন্ধান অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু বৈদিক দেবভাবনা, ধর্ম-দর্শন, সমাজ ইত্যাদি নিয়ে যত আলোচনা রয়েছে, তার তুলনায় বৈদিক সংগীতের আলোচনা অপেক্ষাকৃত কম। তার কারণ প্রথমত, বৈদিক সংগীত বৈদিক যাগ যজ্ঞে গাওয়ার জন্য বিহিত ছিল। কিন্তু বৈদিক যজ্ঞ ক্রমে অপ্রচলিত হতে হতে সাধারণের নাগালের বাইরে চলে গেল। দ্বিতীয়ত, বৈদিক ভাষার প্রাচীনত্ব, তৃতীয়ত, বর্তমান সংগীতের থেকে তাদের দূরত্ব। কিন্তু বৈদিক ধর্মকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে যাগযজ্ঞের পূর্ণাঙ্গ ঔপপত্তিক ও প্রায়োগিক চর্চা পরম্পরাক্রমে সীমিতগণ্ডীর মধ্যে অনেক পরবর্তীকাল পর্যন্ত সজীব ছিল। আর সেই সঙ্গে যজ্ঞের অনুষঙ্গ হিসাবে সামগান পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছাল। এই গান কতটা তার প্রাচীন রূপ সংরক্ষিত করতে পেরেছে অথবা আদৌ পেরেছে কিনা তা অবশ্যই বিচারসাপেক্ষ। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে এখনো পর্যন্ত বিশ্বের এতো প্রাচীন কোনো সঙ্গীতের

তাত্ত্বিক বা প্রায়োগিক রূপের সন্ধান পাওয়া যায় নি। সাম শব্দটিও বহু প্রাচীন। স্তুতিমূলক যে কবিতা প্রাচীন কালে হিব্রুরা গাইতেন তাদেরও Psalm বলা হত। প্রাচীন মেসোপটেমিয়ায় সুমেরীয়দের প্রার্থনামন্ত্রকে বলা হত ersemma.

যে কোনও বিষয়ের ঐতিহাসিক আলোচনা করার আগে, বিশেষ করে বিষয়টি যদি প্রাচীন হয়, তার সময়কাল জানা আবশ্যিক। বেদের সময়কাল নির্ণয় নিয়ে মতভেদ আছে। তবে সাধারণভাবে ঐতিহাসিক ও গবেষকরা বলেন যে খৃ:পূ. ১৫০০ থেকে ১০০০ অব্দের মধ্যে বৈদিকযুগের সূচনা এবং ঐরকম সময়েই ঋগ্বেদের উৎপত্তি।

বেদ মূলত ধর্মীয়গ্রন্থ আর সামগানও মূলত যজ্ঞীয় গান। বেদের মূলত দুটি ভাগ দেখা যায়, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ। মন্ত্রের সংকলনকে বলা হয় সংহিতা। আর ব্রাহ্মণ অংশে পাওয়া যায় মন্ত্রের প্রায়োগিক ও আনুষঙ্গিক গদ্যাত্মক আলোচনা। আকৃতিগতভাবে মন্ত্র তিন রকম। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্র, গানাত্মক মন্ত্র এবং গদ্যাত্মক মন্ত্র। ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রকে বলা হয় ঋক্, যজুঃ, সাম মন্ত্রের সুরারোপিত রূপটি সামগান^৪ আর অবশিষ্ট যে মন্ত্রগুলি থাকল অর্থাৎ ছন্দোবদ্ধ এবং গানের কবিতা ছাড়া যে গদ্যধর্মী মন্ত্র তাদের নাম যজুঃ^৫। ঋকমন্ত্রের সংকলিত গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতা। ঋগ্বেদের যে মন্ত্রগুলি সাম অর্থাৎ সুরে নিবদ্ধ করে গাওয়া হত তাদের সংকলন সামবেদ-সংহিতা। তাছাড়া অবশিষ্ট মন্ত্ররাজি ‘যজুঃ’ নামে চিহ্নিত। এই মন্ত্রের সংকলনের নাম যজুর্বেদ-সংহিতা। এই সব মন্ত্রই যাগ-যজ্ঞে প্রযুক্ত হত। কোন্ যাগের কোথায়, কিভাবে মন্ত্রগুলি পাঠ করা হবে বা গান করা হবে - তার আলোচনা পাওয়া যায় ‘ব্রাহ্মণ’ অংশে। ঋগ্বেদে যেমন আদি কবিদের সন্ধান পাওয়া যায়, সামবেদে ও তার ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থে পাওয়া যায় প্রাচীন সুর, সুরকার ও গানের কথা।

বৈদিক যাগযজ্ঞে মন্ত্রপাঠ প্রভৃতির জন্য চারজন প্রধান ঋত্বিক থাকতেন এবং তাদের সাহায্য করার জন্য থাকতেন আরো কিছু পুরোহিত ও ঋত্বিক। প্রধান চারজন ঋত্বিক হলেন – হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা। তারা যথাক্রমে ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ এবং অথর্ববেদের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠানে তাদের নির্দিষ্ট কিছু কাজ থাকত। তবে মূলত হোতা মন্ত্র পাঠ করতেন, উদ্গাতা সামগান করতেন, অধ্বর্যু যজ্ঞে আছতি দেওয়া ও আনুষঙ্গিক কাজগুলি করতেন, সবার উপরে ছিলেন অথর্ববেদীয় পুরোহিত ব্রহ্মা। তিনি সকলের কাজকর্ম পরিদর্শন করতেন অর্থাৎ যজ্ঞের সকল ক্রিয়াকর্মের সুষ্ঠু সম্পাদন হচ্ছে কি না তার উপর নজর রাখতেন। এই প্রধান ঋত্বিকদের প্রত্যেকেরই কয়েকজন করে সহকারী ঋত্বিক থাকতেন।

সাধারণত সামগান গাওয়া হত সোমযাগে। সোমরস আছতি দেওয়ার সময় প্রথমে সামগান গাওয়া হত এবং যজ্ঞীয় পরিভাষায় এই গানকে বলা হত স্তোত্র এবং তারপর কিছু মন্ত্র পাঠ করা হত, এই মন্ত্রপাঠকে বলা হত শস্ত্র। স্তোত্রগান করতেন সামবেদীয় ঋত্বিক-রা এবং শস্ত্র পাঠ করতেন ঋগ্বেদের ঋত্বিকগণ। স্তোত্র ও শস্ত্রের উদ্দেশ্য এক অর্থাৎ মন্ত্রের দ্বারা দেবতার গুণকীর্তন। পার্থক্য শুধু পরিবেশনের পদ্ধতিতে। স্তোত্র গাওয়া হত আর শস্ত্র পাঠ করা হত। স্তোত্রগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুটি বা তিনটি মন্ত্র নিয়ে গাওয়া হত। ক্বচিৎ কখনও একটি মন্ত্রেও স্তোত্র গাওয়া হত। কিছু স্তোত্রে আবার তিনটির বেশী মন্ত্রও পাওয়া যায়। একাধিক বারোটি মন্ত্র নিয়ে গঠিত স্তোত্রের নিদর্শনও আছে। সামবেদে এই স্তোত্রগুলি সংকলিত হয়েছে। এই মন্ত্রগুলি অধিকাংশ ঋগ্বেদ থেকেই নেওয়া হয়েছে।

সামবেদ

সামবেদের মোট মন্ত্রসংখ্যা ১৮৭৫, অর্থাৎ এই মন্ত্রগুলি নিয়ে সামবেদের স্তোত্রসমূহ প্রস্তুত হয়েছে। এদের মধ্যে ৯৯ টি মন্ত্র ছাড়া অবশিষ্ট মন্ত্র ঋগ্বেদের থেকে নেওয়া। সামবেদের মূল অংশ দুটি - পূর্বার্চিক ও উত্তরার্চিক। স্তোত্রগুলির প্রারম্ভিক মন্ত্রসমূহ পূর্বার্চিকে সংগৃহীত হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ স্তোত্রগুলি সংকলিত হয়েছে উত্তরার্চিকে। পূর্বার্চিক যেন উত্তরার্চিকের সূচিপত্র। কিন্তু পূর্বার্চিকে বেশ কয়েকটি মন্ত্র পাওয়া যায় যাদের অনুষ্ণু হিসাবে কোনো পূর্ণাঙ্গ স্তোত্রের উল্লেখ উত্তরার্চিকে নেই। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে যে হয়তো প্রথম দিকে একটি মন্ত্রকে আধার করেই স্তোত্র গাওয়া হত তাই পূর্বার্চিকে শুধুমাত্র সেই একক মন্ত্রগুলিকেই সন্নিবিষ্ট করা হয়েছে। এর বিপরীত ঘটনাও লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ উত্তরার্চিকে অনেকগুলি পূর্ণাঙ্গ স্তোত্র পাওয়া যায় যাদের প্রারম্ভিক মন্ত্রটি পূর্বার্চিকে অনুপস্থিত। এর কারণ বলা শক্ত। হয়তো সময়ের সাথে নতুন নতুন যজ্ঞ প্রচলিত হতে থাকল আর সেখানে গাওয়ার জন্য নতুন নতুন স্তোত্র বিহিত হল। এই নতুন স্তোত্রগুলি সরাসরি উত্তরার্চিকেই অন্তর্ভুক্ত হল। যাই হোক, পূর্বার্চিকের মন্ত্রগুলি পাঁচটি কাণ্ডে বিন্যস্ত। তারা হল আগ্নেয়, ঐন্দ্র, পাবমান, আরণ্য ও মহানামী।

এখন প্রশ্ন হল সামবেদের যে ৯৯ টি মন্ত্র ঋগ্বেদে পাওয়া যায় না সেগুলি কোথা থেকে সংগৃহীত হল। ভিন্টারনিত্স্ মনে করেন যে এই মন্ত্রগুলি হয়তো কোনো অজানা শাখা থেকে আহরিত হয়েছে। অনেক সময় ঋগ্বেদের বিভিন্ন মন্ত্র থেকে খণ্ড খন্ড অংশ নিয়ে একটি অর্থহীন মন্ত্র প্রস্তুত করেও সামবেদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তাই সামবেদের অনেক পাঠভেদ দেখা যায়।^৬ আউফ্রেখ্ট এই পাঠভেদের কারণটি ব্যাখ্যা করে বলেন যে এটি একটি ইচ্ছাকৃত বা অনিবার্য ঘটনা, কারণ সামবেদের মূল উপাদান হল সুর, মন্ত্র তার মাধ্যমমাত্র। সামগায়কেরা প্রথমে আর্চিক বা পূর্বার্চিককে অবলম্বন করে সুর আয়ত্ত করতেন তারপর যজ্ঞের প্রয়োজনে স্তোত্রগুলি শেখার জন্য উত্তরার্চিকের পাঠ নিতেন। অর্থাৎ সুরের প্রাধান্যে মন্ত্রের বাণী যেন গুরুত্ব হারিয়ে ফেলেছিল।^৭

সাম ও গানগ্রন্থ

আগেই বলা হয়েছে যে ‘সাম’ শব্দটির অর্থ সুর। প্রাচীন সম্প্রদায়ের মতে বেদ যেমন অপৌরুষেয় সেইরকম সামও অপৌরুষেয়। অর্থাৎ এইরকমই বিশ্বাস ছিল যে সুরগুলি কোনো ব্যক্তিবিশেষের চেষ্টাপ্রসূত নয়। বরং ঋষিদের মনোলোকে সুরগুলি উদ্ভাসিত। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে অনেক সামের নাম পাওয়া যায়। অনেক সময় যে ঋষি যে সাম উদ্ভাবন করেছেন তাঁর নামানুসারে সামের নামকরণ করা হয়েছে। যেমন বামদেব যে সামের উদ্ভাবক সেই সামের নাম বামদেবাসাম, গৌতম ঋষির উদ্ভাবিত সাম গৌতমসাম, চ্যবন ঋষির সাম চ্যবনসাম ইত্যাদি। আবার কখনো যে মন্ত্রে সাম আরোপিত হয়েছে সেই মন্ত্রের ছন্দ অনুসারে সামের নামকরণ হয়েছে, যেমন, গায়ত্রিসাম (গায়ত্রী ছন্দ), বৈরাজসাম (বিরাত ছন্দ) ইত্যাদি। মন্ত্রের অন্তর্গত পদের আধারেও সামের নামকরণ হয়েছে, যেমন, যজ্ঞায়জ্ঞীয় সাম (যজ্ঞা যজ্ঞা ব অগ্নয়ে - সামবেদ ১.৩৫),

বারবন্তীয় সাম (অশ্বং ন ত্বা বারবন্তং – সামবেদ ১.১৭) ইত্যাদি। মন্ত্রের দেবতার নাম অনুসারে অনেক সাম পরিচিত, যেমন, মারুত সাম, বাচঃ সাম, উষসঃ সাম ইত্যাদি। এইভাবে আরও বিভিন্ন কারণে সামের বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে।

সাম ও মন্ত্রের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। সামবেদীয় ব্রাহ্মণগুলিতে সামের সঙ্গে মন্ত্রেরও উল্লেখ করা আছে। অর্থাৎ যজ্ঞের সময় যে সাম যে মন্ত্রকে আশ্রয় করে গাইতে হবে তা নির্দিষ্ট করে বলে দেওয়া আছে। কারণ, অনেক সময় একটি মন্ত্রে একাধিক সাম আরোপিত হতেও দেখা যায়। সাম কখনই আজকের দিনে পরিচিত রাগ-এর সমতুল্য নয়। যে-কোনো কবিতাকে আশ্রয় করে যেমন একটি রাগকে প্রকাশ করা যায়, অথবা একটি কবিতাতে যেমন ইচ্ছেমত একাধিক সুর আরোপ করা যায়, সেইরকম কোন সামগানের গায়ক নিজের ইচ্ছামত যে কোনো ঋক্-মন্ত্রে যে কোনো সাম আরোপিত করতে পারতেন না। কোন্ সাম কোন্ মন্ত্রকে আশ্রয় করে গাইতে হবে তাও নির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে। আধুনিক রাগের মতো সামের এমন কোনও নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আজ খুঁজে পাওয়া যায় না যাতে সামগুলিকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়।

সামগানের সম্পূর্ণ গেয় রূপটি পাওয়া যায় ‘গানগ্রন্থ’ নামের গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের গানের কবিতাগুলি যেমন থাকে গীতবিতানে আর গেয়রূপটি স্বরবিতানে, সেইরকম সামগানের মন্ত্রগুলি থাকে সামবেদে এবং গেয়রূপটি থাকে গানগ্রন্থে। গানগ্রন্থ মোট চারটি – গ্রামগেয়, অরণ্যগেয়, উহ এবং উহ্য। গ্রামগেয় গ্রন্থ পূর্বার্চিকের প্রথম তিনটি অংশের অর্থাৎ আগ্নেয়, ঐন্দ্র ও পবমান কাণ্ডের গেয়রূপ পাওয়া যায়। অরণ্যগেয় গ্রন্থ পূর্বার্চিকের অপর দুটি অংশের অর্থাৎ অরণ্যকাণ্ড ও মহানামী মন্ত্রের গেয়রূপ পাওয়া যায়। উহ্য অংশে সমগ্র উত্তরার্চিকের এবং উহ্য অংশে নানা রহস্যপূর্ণ গানের রূপ বিধৃত আছে। গানগ্রন্থ যেভাবে সামগানগুলির গেয়রূপটি পাওয়া যায় সেইভাবেই যজ্ঞে গানগুলি গাওয়া হয়ে থাকত।

গ্রামগেয় ও অরণ্যগেয় পদদুটির দ্বারা সাধারণভাবে গ্রামে গাওয়ার গান ও অরণ্যে গাওয়ার গান বুঝায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিত গোণ্ডা (Jan Gonda) বলেন, The second song-book, the Āraṇyagāna –which was because of its dangerous and esoteric character to be studied in the forest or desert (āraṇya) –belongs likewise to the Pūrvārcika.^৮

অর্থাৎ আরণ্যগেয় গান অরণ্যে না গাইলে বিপদের সম্ভাবনা। কিন্তু এইরকম চিন্তার ভিত্তি কি তা তিনি নির্দেশ করেননি। বস্তুত এইরকম কোনো আশঙ্কার কথা বৈদিক সম্প্রদায়ে শোনা যায় না এবং কোনো গ্রন্থেও এইরকম কোনও প্রসঙ্গ পাওয়া যায় না। তাছাড়া যজ্ঞেও আরণ্যগেয় গান গাওয়া হত। সেই যজ্ঞ যে অরণ্যে করতে হবে এমন কোনও নির্দেশও পাওয়া যায় না। হতে পারে যে আরণ্যগেয় গান শেখা হয়তো অপেক্ষাকৃত দুরূহ ছিল আর তাই এই গান অরণ্য অর্থাৎ কোন নিরালা জায়গায় অভ্যাস করতে হত বলে এইরকম নাম দেওয়া হয়েছে।

সামগানের গেমরূপ

কোনো কবিতাকে যখন গানরূপে পরিবেশন করা হয় তখন গানের বাণীরূপটি অনেক সময়ই অবিকল থাকে না। সামগানও তার ব্যতিক্রম নয়। সাম-আরোপিত মন্ত্রের যে আকৃতিগত পরিবর্তন হয় সেগুলি ছয়টি প্রক্রিয়ার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। ১) বিকার ২) বিশ্লেষ ৩) বিকর্ষণ ৪) অভ্যাস ৫) বিরাম ৬) স্তোভ। এদের একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হচ্ছে।

বিকার – একটি বর্ণের জায়গায় অন্য বর্ণের স্থাপন। যেমন, মন্ত্রের ‘অগ্নে’ শব্দের অ-কারকে পরিবর্তন করে গানে ‘ও’-কাররূপে পরিবেশন করা।

বিশ্লেষ – একটি বর্ণকে একটি বা একাধিক বর্ণে ভেঙে উচ্চারণ করা। যেমন, ‘অগ্নে’ শব্দের স্থানে ‘ওগ্নাই’ গাওয়া। এখানে বিকার প্রক্রিয়ায় ‘অ’ স্থানে ‘ও’ হয়েছে। ‘গ্নে’-র একারকে বিশ্লেষ প্রক্রিয়ায় ভেঙে ‘আই’ করা হয়েছে। এইভাবে ‘বীতয়ে’ পদটি গানের সময় ‘বীইতোয়াই’ হয়ে যায়।

বিকর্ষণ – হ্রস্ব স্বরকে দীর্ঘস্বরে এবং দীর্ঘস্বরকে প্লুতস্বরে উচ্চারণকে বিকর্ষণ বলা হয়। যেমন, মন্ত্রে পদের বা পদাংশের ‘নি’ অংশটিকে ‘নী’-রূপে উচ্চারণ করাকে বিকর্ষণ বলে। আবার ‘নী’কে প্লুতস্বরে ‘নীই’ বলাকেও বিকর্ষণ বলা হয়।

অভ্যাস – একটি পদকে বা পদাংশকে দুইবার উচ্চারণ করাকে অভ্যাস বলা হয়। যেমন মন্ত্রের ‘বীতয়ে’ পদটিকে গানে দুইবার উচ্চারণ করাও যেমন অভ্যাস, সেইরকম পদটির বিশ্লিষ্ট রূপ ‘বীইতোয়াই’ – এর ‘তোয়াই’ অংশকে দুইবার গাওয়া হলে তাকেও অভ্যাস বলা হয়।

বিরাম – একটি পদকে আংশিক উচ্চারণ করে হঠাৎ থেমে যাওয়াকে বিরাম বলা হয়। যেমন, মন্ত্রের ‘হব্যদাতয়ে’ পদটিকে গান গাওয়ার সময় যদি ‘হ’ বলে থেমে তারপর ‘ব্যদাতয়ে’ অংশটি গাওয়া হয় তবে সেটি হবে বিরাম। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে বর্তমান সঙ্গীতে একটি পদের মধ্যে হঠাৎ বিরতি নেওয়া একটি ত্রুটি হিসাবে গণ্য হয়।

স্তোভ – সামগানে ঋক্ মন্ত্রের বাণীর অতিরিক্ত কিছু বর্ণ, পদ ও বাক্য সন্নিবেশিত করা হয় তাদের বলা হয় স্তোভ। স্তোভের আকৃতি অনুসারে স্তোভকে তিনভাগে ভাগ করা যায় – বর্ণস্তোভ, পদস্তোভ এবং বাক্যস্তোভ। হো, হা, ও, উ ইত্যাদি বর্ণস্তোভ, হাউ, হোবা, ওহোবা ইত্যাদি পদস্তোভ। প্রখ্যাত বঙ্গীয় বেদজ্ঞ সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয় পাঁচপ্রকার বর্ণস্তোভ এবং নয় প্রকার বাক্যস্তোভের উল্লেখ করেছেন*। বাক্যস্তোভ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, আশস্তি (অর্থাৎ আশীর্বাদ), স্তুতি, বিলাপ, প্রৈষ (অর্থাৎ নির্দেশ) ইত্যাদি অর্থে কয়েকটি বিশেষ বাক্য কোনো কোনো সামগানের মধ্যে সংযোজন করা হত, যেমন, ‘অগ্নম্ জ্যোতিরমৃতা অভূম্’, ‘নমো’ন্নায় নমো’ন্নপতয়ে’, ‘যে দেবদেবাঃ নিষিদঃ অন্তরিক্ষসদঃ পৃথিবীষদঃ’, ‘এতত্‌সংখ্যানং রিশাম ইন্দ্রঃ’ ইত্যাদি। অর্থাৎ বাক্যস্তোভ বলে যাদের চিহ্নিত করা হয়েছে সেইগুলি বর্ণস্তোভ বা পদস্তোভের মত অর্থহীন ছিল না।

অনেক সময় মন্ত্রের পরিবর্তে শুধুমাত্র স্তোভকে আশ্রয় করেও সামগান গাওয়া হত। এই গানকে

‘ছন্দগান’ বলা হয়। তবে এই রকম গানের সংখ্যা খুবই কম। আবার কয়েকটি সামগান আছে যাতে কোনো স্তোভ আরোপিত হত না শুধুমাত্র ঋকমন্ত্রকে আশ্রয় করেই গাওয়া হত। এইগানও খুব বেশী পাওয়া যায় না। জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে দুই প্রকার সামগানের উল্লেখ আছে, স্তোভযুক্ত ও স্তোভহীন – দে উ বাব সামনী স্তোভবচৈবাস্তোভবচ্চ^{১০}।

যজ্ঞীয় গানে এই আপাত অর্থহীন স্তোভের উচ্চারণ করার কি কারণ থাকতে পারে এই প্রশ্ন ওঠা খুব স্বাভাবিক। ব্রাহ্মণগ্রন্থগুলিতে স্তোভের প্রশংসা করা হয়েছে আর সামগানে কোন্ স্তোভের কি তাৎপর্য তাও নানাভাবে অর্থবাদের মাধ্যমে বিবৃত করা হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে স্তোভের মাধ্যমে প্রতীক-উপাসনা বিহিত হয়েছে^{১১}। আবার উপনিষদে দেখা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে ঋষি প্রাণের আনন্দে বলে উঠলেন ‘হাবু হাবু’। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা সাধারণভাবে এই অর্থহীন ধ্বনিকে মানুষের উল্লাসব্যঞ্জক শব্দ বলে মনে করেন^{১২}। আবার একথাও মনে করা হয় যে এই স্তোভগুলি প্রকৃতপক্ষে সামগানের লৌকিকধর্ম বা উৎসবের প্রভাবের পরিচায়ক। অথবা এই স্তোভগুলি কোনো প্রাচীন অবৈদিক ঐন্দ্রজালিক পুরোহিতদের কাছ থেকে পাওয়া^{১৩}। তবে তিন প্রকার স্তোভের মধ্যে সম্ভবত বাক্যস্তোভ পরবর্তীকালে সামগানে সংযোজিত হয়েছে।

সামগানের পুনরাবর্তন ও স্তোম

যজ্ঞে গাওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে সামগানের পুনরাবৃত্তির বিধান দেখা যায়। একবার গাইলে পরিপূর্ণ রসাস্বাদন হয় না। তাই বোধ হয় এই পুনরাবৃত্তির বিধান। তবে এখানে পুনরাবৃত্তির ক্ষেত্রে সামগায়কের কোনো স্বাধীনতা থাকত না। কোন্ স্তোত্রের কোন্ অংশ কখন কতবার আবৃত্তি করতে হবে তার বিধান দেওয়া আছে যজ্ঞগ্রন্থে। একটি মন্ত্রকে দুইবার আবৃত্তি করলে আকৃতিগতভাবে দুটি মন্ত্রের সমান হয়। এইভাবে আবৃত্তির ফলে মন্ত্রের মোট যে সংখ্যা পাওয়া যায় তার নাম স্তোম। ত্রিবৃত, পঞ্চদশ, সপ্তদশ, একবিংশ প্রভৃতি নানা প্রকার স্তোম হয়। তিনটি পর্যায়ে আবৃত্তি করে অভীষ্ট সংখ্যায় পৌঁছতে হয়। যেমন, তিনটি ঋকের একটি স্তোত্রকে পঞ্চদশ স্তোমে পরিণত করতে হয়তো প্রথম পর্যায়ে প্রথম মন্ত্রটি একবার, দ্বিতীয় ও তৃতীয় মন্ত্রটি দুইবার করে গাওয়া হল। দ্বিতীয় পর্যায়ে দ্বিতীয় মন্ত্রটি একবার, প্রথম ও তৃতীয় মন্ত্রটি দুইবার করে গাওয়া হল। তৃতীয় পর্যায়ে তৃতীয় মন্ত্রটি একবার, প্রথম ও দ্বিতীয় মন্ত্রটি দুইবার করে গাওয়া হল। এইভাবে প্রতি পর্যায়ে পাঁচটি করে মন্ত্র নিয়ে তিনটি পর্যায়ে মোট পঞ্চদশ সংখ্যা লাভ করা গেল।

সামগানের ভক্তি বা ভাগ

সামগান গাওয়ার সময় গানটিকে পাঁচটি বা সাতটি ভাগে ভাগ করে গাওয়া হত। একেকটি ভাগকে বলা হয় ভক্তি। এই ভাগ গুলিকে বর্তমানযুগের গানের স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চরী, আভোগ এই চারটি ভাগের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। গানের প্রথম অংশটি স্থায়ী, দ্বিতীয় অংশটি অন্তরা, তৃতীয়টি সঞ্চরী এবং চতুর্থ ও শেষভাগ আভোগ নামে পরিচিত। সেইরকম সামগানের সাতটি ভাগ হল যথাক্রমে – হিঙ্কার (অর্থাৎ হিম্ব বা হুম্ব ধ্বনি করা), প্রস্তাব, আদি (অর্থাৎ ওম), উদগীথ, প্রতিহার, উপদ্রব ও নিধন^{১৪}। সাতভাগে

বিভক্ত সামকে বলা হয় সাপ্তভক্তিক সাম। এছাড়া পাঞ্চভক্তিক সামও কখনও হয় যেখানে হিংকার এবং আদি (ওঙ্কার) অংশকে যথাক্রমে প্রস্তাব ও উদগীথের অংশের অন্তর্গত করলে শুধু পাঁচটি ভাগেই সামকে বিভক্ত করা থাকে^{২৫}। সামবেদীয় ঋত্বিক উদগাতা তিনজন সহকারী ঋত্বিক সামগান করে থাকেন। তিনজন সহকারীর নাম প্রস্তোতা, প্রতিহর্তা ও সুব্রক্ষণ্য। গানের প্রস্তাব অংশ গান করেন প্রস্তোতা, উদগীথ অংশ উদগাতা, প্রতিহার অংশ গান করেন প্রতিহর্তা, উপদ্রব অংশ গান করেন আবার উদগাতা এবং নিধন অংশ গাইতে হয় সমবেতভাবে। উদগাতা প্রভৃতি মূল গায়ক ছাড়াও উপগাতা নামে কয়েকজন গানের ধ্যোদারী থাকেন, তাঁরা প্রস্তোতা ও প্রতিহর্তার গানের মাঝখানে সুর ধরেন। এঁরা কোনো গান করেন না, শুধু সুর করে ‘ওওও’ বা ‘হোহোহো’ বলতে থাকেন। অনেক সময় যজমানও এই সুরধারার কাজটি করেন। কোনো কোনো যজ্ঞে যজুর্বেদীয় ঋত্বিক অধ্বর্যুও সামগান করে থাকেন।

বৈদিক স্বরসপ্তক

বৈদিক সাতটি স্বরের নাম ছিল, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্টি। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৈদিক স্বরসপ্তক অবরোহণাত্মক ছিল। লৌকিক স্বরসপ্তকের সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায় যে বৈদিক সপ্তক প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, মন্দ্র, অতিস্বার্য ও ক্রুষ্টি যথাক্রমে লৌকিক সপ্তস্বর ম, গ, রে, সা, নি (অথবা ধ), ধ (অথবা নি), প এর অনুরূপ। তাই গানগ্রন্থে ১ সংখ্যার দ্বারা লৌকিক মধ্যম স্বর, ২ সংখ্যার দ্বারা লৌকিক গান্ধার ইত্যাদি বুঝতে হবে। বৈদিক ও লৌকিক স্বরসপ্তকের সম্পর্কটি নীচে দেখানো হল-

বৈদিক	লৌকিক
প্রথম	মধ্যম
দ্বিতীয়	গান্ধার
তৃতীয়	ঋষভ
চতুর্থ	ষড়্জ
মন্দ্র	নিষাদ/ধৈবত
অতিস্বার্য	ধৈবত/নিষাদ
ক্রুষ্টি	পঞ্চম

মন্দ্র ও অতিস্বার্যের লৌকিকঅবস্থান নিয়ে মতভেদ আছে। দুটি পাঠই পাওয়া যায়। কোন কোন বিশেষজ্ঞ ঋজুগতির পাঠের পক্ষপাতী, কেউ বা বক্রগতির সপ্তকের।

আলঙ্কারিক স্বরবিন্যাস

সামগানে নানা প্রকার স্বরবিন্যাসের প্রচলন ছিল। তাদের পারিভাষিক নাম ও পরিচয় সামবেদীয় শিক্ষাগ্রন্থ মাত্রালঙ্কারে পাওয়া যায়, যেমন প্রত্যুত্ক্রম, অতিক্রম, কৰ্ষণ, নমন, প্রণত ইত্যাদি। প্রত্যুত্ক্রমে কোনো একটি স্বরকে মাঝখানে রেখে অন্য স্বরগুলিকে দিয়ে পরিক্রমণ করা হত। আবার, অতিক্রমে একটি স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়ার সময় স্বর দুটির মধ্যবর্তী স্বর বা স্বরগুলিকে অতিক্রম করা হত। নমনে প্রথম স্বর থেকে দ্বিতীয়স্বরে অবরোহণ করা হয় এবং এই নমন প্রক্রিয়াটি গানগ্রন্থে ‘ন’ অক্ষরের দ্বারা জ্ঞাপিত হয়। বিনত নামক প্রক্রিয়াতেও প্রথম থেকে দ্বিতীয় স্বরে যাওয়া বঝায়। দুটির পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে কেউ কেউ বলেন নমনে প্রথম স্বর থেকে দ্বিতীয় স্বরে যাওয়ার সময় তৃতীয় স্বরটিকে স্পর্শ করতে হয়, কিন্তু বিনত প্রক্রিয়াতে সোজাভাবে যাওয়া হয় এবং স্বরলিপির নির্দিষ্ট অক্ষরের ওপর ‘বি’ চিহ্ন দেওয়া থাকে। আবার দ্বিতীয় স্বর থেকে তৃতীয় স্বর যাওয়ার প্রক্রিয়াকে বলা হয় প্রণত। চতুর্থ স্বর থেকে মন্দ্র স্বরে অবরোহণকে বলে উত্সারিত। একই স্বরের বা অক্ষরের মধ্যে দ্বিতীয় থেকে প্রথম স্বরে আরোহণ করাকে বলা হয় অভিগীত। এই সব থেকে অবশ্যই মনে করা যায় যে সামগান যথেষ্ট পরিশীলিত ও সমৃদ্ধ ছিল।

প্রাচীন স্বরলিপি

গানগ্রন্থে যখন কবিতাগুলি সংকলিত হয়েছে তখন শুধুমাত্র তাদের আকৃতিগত পরিবর্তনই করা হয়নি গানের সুর ও গেয় রূপটি বঝানোর জন্য কিছু চিহ্নও সংযোজিত হয়েছে। বিভিন্ন চিহ্নের বিভিন্ন অর্থ আছে। যেমন অক্ষরের ওপরে ১,২,৩ প্রভৃতি সংখ্যাগুলি সেই সেই অক্ষরের স্বরসূচক। অর্থাৎ ১ সংখ্যার দ্বারা বৈদিক স্বরক্রমের প্রথম স্বরকে বঝান হয়, ২ সংখ্যার দ্বারা দ্বিতীয় স্বরকে, ৩ সংখ্যার দ্বারা তৃতীয় স্বরকে ইত্যাদি। অক্ষরের ওপরে লেখা র,ক,উ বর্ণগুলি যথাক্রমে দীর্ঘস্বর, উঁচুস্বর ও নীচুস্বরকে বোঝায়। অক্ষরের ওপরে আনুভূমিক রেখা (--) থাকলে তার অর্থ হবে অক্ষর-সংলগ্ন স্বরটিকে তিনগুণ করে গাওয়া ইত্যাদি। সামবেদীয় ব্রাহ্মণদের সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন চিহ্ন ব্যবহারেরও রীতি আছে। এইরকম নানা চিহ্ন দিয়ে গানের একটি স্বরলিপি তৈরী করার প্রথম প্রয়াস গানগ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়।

গানের সুরকে ধরে রাখার একনিষ্ঠ প্রয়াস প্রাচীন কাল থেকেই ছিল। স্বরলিপির মাধ্যমে যেমন চেষ্টা হয়েছিল, সেইরকম গানের শিক্ষা, অভ্যাস ও পরিবেশনের সময় সামহন্ত বা গাত্রবীণার মাধ্যমে সুর ধরে রাখার এক অনন্য প্রয়াস করা হত। সামগায়াকরা তাদের ডানহাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি দিয়ে অন্যান্য অঙ্গুলির নির্দিষ্ট রেখা নির্দেশ করতেন। এই রেখাগুলি একেকটি স্বরের পরিচায়ক। যখন যে স্বর গাইতেন তখন সেই স্বর নির্দেশিত হত ডানহাতে। সামগানের স্বরূপটি জানার আগ্রহ আজও আছে। পাশ্চাত্য গবেষকদের মধ্যে Louis Renou সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য রীতিতে সামগানের স্বরলিপি তৈরী করেন^{১৬}। Wayne Howard তাঁর সম্পাদিত মাত্রালঙ্কারের ভূমিকায়^{১৭} রথন্তরসামের স্বরলিপি উপস্থাপিত করেছেন। তবে এই বিষয়ে শ্রী রাজ্যেশ্বর মিত্রের প্রয়াস বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি তাঁর ‘বৈদিক সাহিত্যে সামগান’ গ্রন্থে বহু সামগানের স্বরলিপি আকারমাত্রিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত করেছেন।

বৈদিকযজ্ঞের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সামগানের প্রচলনও কমে যায়। বর্তমানে খুবই সীমিত পরিসরে এইগানের চর্চা করা হয়। সামগানের প্রকৃত সুর আজ অনেকটাই বিস্মৃত আর এই বিস্মরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল বহু পূর্বেই। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সুর বিকৃতি। মহাভাষ্যে বলা হয়েছে ‘সহস্রবর্ত্তা সামবেদঃ’। সামবেদে সুরের সংখ্যা অজস্র তাই সামবেদকে সহস্রবর্ত্তা বলা হয়েছে। সহস্রবর্ত্তা শব্দটি শাখা বৈচিত্র বা সুরবৈচিত্র যাই বোঝাক না কেন তা সম্ভবত অজস্র সুরবিকৃতির ইঙ্গিতকেও বহন করছে।

গান্ধর্ব:

সামগান সকলের কাছে সম্ভ্রমযোগ্য হলেও তার কঠোর অনুশাসনের জন্য সাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য হল না এবং সাধারণের তাতে অধিকারও ছিল না। এই অবস্থায় এক নতুন ধরনের সংগীতধারার প্রচলন ছিল, যা গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের নিরিখে সামগানের প্রায় সমতুল্য। এই সঙ্গীত সামগানের জটিলতা থেকে মুক্ত এবং গোষ্ঠীভিত্তিক না হওয়ায় সব শ্রেণীর সঙ্গীতরসিক মানুষের কাছে অব্যাহতদ্বার। সঙ্গীতের এই ধারাটির নাম হল গান্ধর্ব। গান্ধর্বরা হলেন সঙ্গীতকুশলী দেবপ্রতিম পৌরাণিক চরিত্র। মহাভারতে বলা হয়েছে – গান্ধর্বা গীতিকুশলা নৃত্যে চ বিশারদাঃ^{১৮}। তাঁদের সাস্ত্রাত্মক প্রতিভাকে স্মরণে রেখে সম্ভবত এই নামকরণ হয়েছিল। আবার গান্ধার দেশে এই সঙ্গীতধারার উদ্ভব বলে গান্ধর্ব নামকরণ হয়েছে – এই সম্ভাবনার কথাও কেউ কেউ বলে থাকেন। গান্ধর্বের প্রসঙ্গ রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলিতে পাওয়া যায়। গান্ধর্বের পরিচয়ের জন্য অবৈদিক প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রয়োজন। বৈদিক সঙ্গীতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় যে সঙ্গীতশাস্ত্রগুলি আছে তাদের মধ্যে প্রাচীনতম হল ভারতের নাট্যশাস্ত্র। যদিও নাট্যশাস্ত্রের মূল আলোচ্য বিষয় হল নাট্যকলা, কিন্তু নাটকের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে সঙ্গীতের আলোচনা এখানে ছয়টি অধ্যায়ে পাওয়া যায়। নাট্যকলার সঙ্গে যুক্ত যারা ছিলেন তাঁদের ভারত বলা হত।

গান্ধর্বের ব্যাখ্যা করে আচার্য ভারত বলেছেন-

অতর্থমিষ্টং দেবানাং তথা প্রীতিকরং পুনঃ।

গান্ধর্বাণাং চ যস্মাদ্ধি তস্মাদ্ গান্ধর্বমিত্যুচ্যতে।।

অস্য যোনির্ভবেদগানং বীণাবংশস্তথৈব চ।

এতেষাং চৈব বক্ষ্যামি বিধিং স্বরসমুখিতম্।। ৮

অর্থাৎ, দেবতা ও গান্ধর্বদের অত্যন্ত অভীক্ষিত ও প্রীতিকর বলে এই সঙ্গীতকে গান্ধর্ব বলা হয়। এর উৎস হল গান অর্থাৎ সামগান, বীণা ও বংশ। ভাষ্যমতে বংশ বলতে নারদ প্রমুখ গান্ধর্বকুল এবং তাঁদের অভিমতকে বুঝানো হয়েছে। ভারত বলেছেন, এদের স্বরসম্মিলনের নিয়মবিধি আলোচনা করব।

গান্ধর্ব সামগানের মত স্থির ও অপরিবর্তনীয় ছিল না। বিভিন্ন বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গান্ধর্বের যাত্রা। প্রথমদিকে গান্ধর্বে জাতিগানের প্রচলন ছিল। পরবর্তী কালে সেখান থেকে গ্রামরাগের উদ্ভব হল। জাতিগানের উল্লেখ রামায়ণে পাওয়া যায়। মহাভারত ও হরিবংশে গ্রামরাগের প্রসঙ্গ আছে। নারদীয় শিক্ষাতেও একুশটি গ্রামরাগের নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ সঙ্গীতের এই ধারায় সামগানের কিছু উপাদান থাকলেও তার একটি

স্বকীয় পদ্ধতি ও গতি ছিল যা তাকে সামগান থেকে স্বতন্ত্র করে তুলেছিল। যাই হোক, সামগান থেকে গান্ধর্বে উৎপত্তি হলেও এই দুটি সঙ্গীত চরিত্রগতভাবে আলাদা। মূর্ছনা, গ্রাম, তাল, জাতি, রাগ, বাদ্যযন্ত্র প্রভৃতি যে বিষয়গুলি নাট্যশাস্ত্রে গান্ধর্বে প্রসঙ্গে আলোচিত হয়েছে তা সামগানের ঔপপত্তিক আলোচনা থেকে স্বতন্ত্র। এমনকি বৈদিক সপ্তস্বর গান্ধর্বে সপ্তস্বরের নাম ও অবস্থান আলাদা। ভারত বলেছেন ‘গান্ধর্বং ত্রিবিধং বিদ্যাৎ স্বরতালপদাত্মকম্’ অর্থাৎ স্বর, তাল ও পদ –এই তিনটিকে আশ্রয় করে গান্ধর্বে অবস্থান এবং তিনি তাঁর গ্রন্থে এই গান্ধর্বে লক্ষণ ও প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এই গ্রন্থে সঙ্গীত শব্দটির প্রয়োগ নেই বললেই হয়। হাতে গোনা যে শ্লোকগুলিতে পাওয়া যায় সেইগুলি আবার সব সংস্করণে পাওয়া যায়না।

বৃহদ্দেশী:

ভারতীয় সঙ্গীতের আবার একটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় মতঙ্গের বৃহদ্দেশী গ্রন্থে (আনু. ৫ম-৮ম শতক)। এই গ্রন্থটি নানাকারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে সর্বপ্রথম রাগের আলোচনা করা হয়েছে। এইখানে সর্বপ্রথম সরগম-এর আলোচনা পাওয়া যায়। তান্ত্রিকধারায় নাদের আলোচনা গ্রন্থটিকে একটি বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে। এছাড়া শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্ছনা প্রভৃতির আলোচনায় নতুন আলোকপাত করেছে গ্রন্থটি। এই গ্রন্থের বিশেষতা হল ‘মার্গ’ সঙ্গীতের সঙ্গে ‘দেশী’ সঙ্গীতের উপস্থাপনা। বৃহদ্দেশী গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও পরবর্তী গ্রন্থকারদের কাছে এটি প্রায় আকরগ্রন্থের মত বিবেচিত হয়েছে।

‘দেশ’ ও ‘দেশী’ শব্দটি মতঙ্গ ভিন্ন ভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছেন। গ্রন্থের প্রারম্ভিক শ্লোকে বলেছেন- ‘নানাবিধেষু দেশেষু জন্তুনাং সুখদো ভবেৎ। ততঃ প্রভৃতি লোকানাং নরেন্দ্রাণাং যদৃচ্ছয়া।। দেশে দেশে প্রবৃত্তো’সৌ ধ্বনির্দেশীতি সংজ্ঞিতঃ।’ এখানে দেশ বলতে অঞ্চল (region) বুঝানো হয়েছে। বিভিন্ন দেশে রাজা ও জনগণের সুখদায়ক ধ্বনিকে দেশী ধ্বনি বলা হয়- ‘দেশে দেশে প্রবৃত্তো’সৌ ধ্বনির্দেশীতি সংজ্ঞিতঃ’^{১৯}। মতঙ্গ বলেছেন সঙ্গীত ও দেশভাষা এই দুই জায়গাতেই স্বর সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বাক্যে এই স্বর হল স্বরবর্ণ এবং সঙ্গীতে এই স্বর হল সা রে গ ম ইত্যাদি। এখানে দেশভাষা শুধুমাত্র আঞ্চলিক ভাষাকে বুঝাচ্ছে না, সংস্কৃতভাষাকেও বুঝাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য পাণিনি তাঁর অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে ভাষা বলতে সংস্কৃতকেই বুঝিয়েছেন।

সঙ্গীতে দেশির লক্ষণ নির্ণয় করতে গিয়ে মতঙ্গ বলেছেন-

অবলাবালগোপালৈঃ ক্ষিতিপালৈর্নিজেচ্ছয়া।

গীযতে সানুরাগেণ স্বদেশে দেশিরূচ্যতে।।^{২০}

অর্থাৎ মহিলা, শিশু, রাখাল, রাজা প্রমুখ মানুষেরা তাদের খেয়াল খুশিমত আঞ্চলিক সুরে যে গান গেয়ে থাকেন তাই দেশী। অর্থাৎ দেশী শুধুমাত্র সাধারণ জনগণের প্রিয় ছিল না, রাজার মত অভিজাতদেরও প্রিয় ছিল। এর পরের শ্লোকটিতে মার্গ ধারার কথা বলা হয়েছে-

নিবন্ধশচনিবন্ধশচ মার্গো'য়ং দ্বিবিধো মতঃ।
আলাপাদিনিবন্ধো যঃ স মার্গঃ প্রকীর্তিতঃ ।।^{২১}

অর্থ হবে – দেশী পদ্ধতি পরিবেশনের দুটি পথ আছে, নিবন্ধ ও অনিবন্ধ। আলাপ প্রভৃতির দ্বারা নিবন্ধ গানকে মার্গ বলে এবং অপরটি দেশী। অর্থাৎ এই অবৈদিক দেশীর দুটি প্রকারভেদ, নিবন্ধ বা মার্গ এবং অনিবন্ধ বা দেশী। মতঙ্গ তার গ্রন্থে গান্ধর্ব শব্দের কোনো উল্লেখ করেননি বা এখানে মার্গের প্রতিশব্দ হিসাবে গান্ধর্ব পদটির ব্যবহার করেন নি। যদিও পরবর্তী কালে সঙ্গীতশাস্ত্রকাররা মার্গ ও গান্ধর্বকে সমপর্যায়ভুক্ত বলে মনে করেন। উল্লেখযোগ্য যে এই গ্রন্থেও সঙ্গীত শব্দটি অনুপস্থিত।

সঙ্গীতরত্নাকর

মার্গ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শতকে রচিত শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থে। এই গ্রন্থটি মতঙ্গের বৃহদেশীর পর সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতশাস্ত্র। শার্ঙ্গদেবের মতে মার্গ শব্দটি এসেছে অশ্বেষণার্থক 'মৃগ্' ধাতু থেকে। সামবেদের লুপ্তপ্রায় ধারাকে অশ্বেষণ করে এই নতুন পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছিল আর তাই তার আর এক নাম 'মার্গ'। সঙ্গীতরত্নাকরে বলা হয়েছে যে ব্রহ্মা প্রভৃতি এই সঙ্গীত অশ্বেষণ করেছেন এবং ভরত প্রমুখ তা প্রয়োগ করেছেন – 'যো মার্গিতো বিরিধ্যাদ্যৈঃ প্রযুক্তো ভরতাদিভিঃ'^{২২}। সঙ্গীতরত্নাকরে আরও বলা হয়েছে, 'সামবেদাদিদং গীতং সংজগ্রাহ পিতামহঃ'-পিতামহ ব্রহ্মা সামবেদ থেকে এই সঙ্গীতের জন্য গানের উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন। আর এই গীত বা সুর এতই মনোগ্রাহী যে মহেশ্বর, শ্রীকৃষ্ণ, ব্রহ্মা ও সরস্বতীর প্রীতি উৎপাদন করে, যক্ষ, দেবতা, দানব ও মানুষদের আনন্দ দেয়, এমন কি শিশু, বনচর পশু, মৃগশাবক প্রভৃতিও এই সঙ্গীতের অমৃতরস পান করে আমোদিত হয়। এই লক্ষণ গান্ধর্বের লক্ষণের অনুরূপ। তাই মনে হয় মতঙ্গ গান্ধর্ব নামটির পরিবর্তে মার্গ শব্দের ব্যবহার করেছেন।

বস্তুত বৃহদেশী গ্রন্থে যে দেশীর আলোচনার সূচনা ঘটে তা শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীত রত্নাকরে গান্ধর্ব থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশী সম্বন্ধে শার্ঙ্গদেব মতঙ্গকে অনুসরণ করে বলেছেন –

দেশে দেশে জনানাং যদ্ রচ্যা হৃদয়রঞ্জকম্।
গানং চ বাদনং নৃত্যং তদ্দেশীত্যভধীয়তে।।^{২৩}

অর্থাৎ, ভিন্ন ভিন্ন দেশে সেই স্থানের জনরুচি অনুসারে মনোরঞ্জনকারী গান, বাজনা ও নৃত্য হল দেশী।

সঙ্গীত রত্নাকরের প্রথমে সঙ্গীতের লক্ষণ দিয়েছেন গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সঙ্গীতমুচ্যতে। প্রবন্ধাধ্যায় নামক চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমেই গীতকে গান্ধর্ব ও গান –এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। টীকাকার কল্লিনাথ বলেন যে গান্ধর্ব হল মার্গ এবং গান বলতে দেশীকেই বুঝতে হবে। গান্ধর্ব সঙ্গীত ব্রহ্মার দ্বারা পরিকল্পিত বলে বেদের মত অপৌরুষেয় ও শ্রেয়স্কর। অপর পক্ষে বাগ্গেয়কারেরা দেশজ রাগে যে গীত রচনা করেছেন তাকেই গান বলা হয়^{২৪}। এখানে 'গান' একটি বিশেষ পরিভাষা যার অর্থ এক বিশেষ

সঙ্গীত পদ্ধতি আর গান্ধর্বে বিপরীতে দেশী সঙ্গীত হিসাবে তার অবস্থান। অতএব ‘গান’ আর ‘দেশী’ সমার্থক।

সম্ভবত মতঙ্গের সময় থেকেই গান্ধর্ব থেকে দেশীর জনপ্রিয়তা উত্তরোত্তর বাড়ছিল। সঙ্গীত রত্নাকর গ্রন্থটি গান্ধর্বে লোপ পেয়ে যাওয়ার কিছু সাক্ষ্য বহন করে। গান্ধর্ব ও গানের লক্ষণ দেওয়ার পর শার্ঙ্গদেব বললেন – ‘তত্র গান্ধর্বমুক্তং প্রাক্ অধুনা গানমুচ্যতে’^{২৫}। গান্ধর্বে কথা আগেই বলা হয়েছে এখন গান সম্বন্ধে বলা হবে। ‘উক্তং প্রাক্’ অংশটির ব্যাখ্যা করে টীকাকার কল্লিনাথ বলেন, গ্রন্থের প্রথম তিনটি অধ্যায়ে গান্ধর্ব সম্বন্ধে বলা হয়েছে এরপর চতুর্থ অধ্যায়ে থেকে গানের অর্থাৎ দেশী সঙ্গীতের আলোচনা হবে। কল্লিনাথের বক্তব্য অনুসারে সঙ্গীতরত্নাকরের সাতটি পরিচ্ছেদের মধ্যে প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে গান্ধর্বে এবং পরবর্তী চারটি পরিচ্ছেদে দেশীর আলোচনা করেছেন শার্ঙ্গদেব। কল্লিনাথের এই বক্তব্য কতটা গ্রহণযোগ্য তা আলোচনাসাপেক্ষ। তৃতীয় অধ্যায়ের বাইরেও শার্ঙ্গদেব গান্ধর্বে আলোচনা করেছেন। তালাধ্যায় নামক পঞ্চম অধ্যায়ে মার্গ ও দেশী উভয় তালের আলোচনা করেছেন। ঐ একই অধ্যায়ে ব্রহ্মগীতির বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এই গীত হল সামগানের মত স্তোভযুক্ত অর্থাৎ অর্থহীন পদযুক্ত ও ব্রহ্মাকর্তৃক পরিবেশিত – স্তোভভঙ্গীং বিজানীয়াত্ সাম্নো বৈদিকসম্মতং ব্রহ্মণা চ পুরা গীতম্^{২৬}। শার্ঙ্গদেবের সময় গান্ধর্ব অপ্রচলিত হয়ে গেলেও তিনি নিজে কিন্তু এই প্রাচীন রীতির সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন এবং তাঁর গ্রন্থ থেকেও তা স্পষ্ট। দেশীর প্রতি তাঁর স্বাভাবিক অনুরাগ থাকলেও প্রাচীন লুপ্তপ্রায় গান্ধর্বে অবহেলা করেননি তিনি। অতএব ‘উক্তং প্রাক্’ বলতে গান্ধর্ব সম্বন্ধে তাঁর পূর্বাচার্যদের মতামত তিনি স্মরণ করেছেন এমনও ভাবা যেতে পারে। তবে দেশী সম্পূর্ণভাবে গান্ধর্বে প্রভাব থেকে মুক্ত ছিল বলে মনে হয় না। সেইরকম গান্ধর্ব ও সামগান যে লৌকিকপ্রভাব থেকে মুক্ত ছিল তাও সম্ভবত নয়। কিন্তু আঞ্চলিক জনরুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে পরিবর্তনকে জায়গা করে দেওয়াতে মানুষের কাছে দেশী অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হয়েছিল।

শার্ঙ্গদেবের সঙ্গীতরত্নাকর গ্রন্থটি ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু বিষয়গতভাবে নয়, ইতিহাসের দৃষ্টিতেও সঙ্গীতরত্নাকরের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে একাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক মধ্যযুগ বলে পরিচিত। এই যুগটি ছিল ইসলামশাসনের সময়কাল। কিন্তু একাদশ শতকের অনেক আগে সপ্তম শতক থেকেই ভারতে আরব-তুর্কীদের আক্রমণ শুরু হয়। ঐ সময় থেকে মুসলিমদের নানা গোষ্ঠীর উপর্যুপরি আক্রমণে উত্তর ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে এবং ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের উল্লেখযোগ্য পরবর্তন ঘটে। তাই অনেকেই মনে করেন যে সপ্তম-অষ্টম শতকে মুসলিমশাসনের সূচনার থেকেই মধ্যযুগের আরম্ভ। মুসলিম আক্রমণ, সংঘাত, অভিঘাত ও হত্যালীলার সংগেই চলল সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান। দুই সম্প্রদায়ের জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প সংস্কৃতির প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আগ্রহ এক সাংস্কৃতিক মেলবন্ধন ঘটাল যার প্রভাব পড়ল সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও।

আমীর খুসরো

শার্ঙ্গদেবের সমসাময়িক ছিলেন আমীর খুসরো। পারস্য থেকে আসা আমীর খুসরো বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন আর সেই সঙ্গে হিন্দু সংস্কৃতির বিশেষ গুণগ্রাহী। ফার্সী, তুর্কী, আরবী ছাড়াও তিনই হিন্দী, ব্রজভাষা ও সংস্কৃত ভাষাতেও ব্যুৎপন্ন ছিলেন। ভারতীয় সঙ্গীতের তাত্ত্বিক দিকটিতেও ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। সুফী মতবাদে বিশ্বাসী এই মানুষটি ছিলেন হিন্দু ও মুসলিম সংস্কৃতির ঐক্যসাধনে প্রয়াসী। প্রচলিত ভারতীয় ও পারস্য সঙ্গীতের মিশ্রণে তিনি এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেন। নতুন আঙ্গিকের গীতরীতির উদ্ভাবন করেন তিনি, যেমন, খেয়াল, তারানা, গজল, কাওয়ালি প্রভৃতি। কয়েকটি নতুন রাগ ও তাল ভারতীয় সঙ্গীতে প্রচলন করেন। রাগের মধ্যে ইমন, পূরবী, শাহানা, সাজগিরি, জিলফ, পুরিয়া প্রভৃতি এবং তালের মধ্যে সওয়ারি, ফরদোস্ত, যৎ, পাস্তা, ঝুমরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অনেকে মনে করেন যে, এগুলি ভারতীয় সঙ্গীতে আগেই ছিল অন্য নামে, আমীর খুসরো শুধুমাত্র তাদের পারস্যীকরণ করেছেন। সেতার ও তবলাও আমীর খুসরোর উদ্ভাবন বলে মনে করা হয়। এইভাবে এইসময় উত্তরভারতে প্রচলিত ভারতীয় সঙ্গীত একটি বিশাল পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি নতুন রূপ ধারণ করল। পারস্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত এই সঙ্গীত তদানীন্তন শাসকদের কাছেও বেশি গ্রহণযোগ্য হয়েছিল। রাজদরবারে অধিক গ্রহণযোগ্যতা সম্ভবত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের পরিবর্তনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক ছিল।

দক্ষিণভারতে মুসলিম অনুপ্রবেশ অপেক্ষাকৃত কম ছিল বলে সেখানে ভারতীয় সঙ্গীতের চর্চা প্রাচীন পদ্ধতিতেই হতে থাকল। এতদিনের ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় সঙ্গীত সুস্পষ্ট দুটি ধারায় বিভক্ত হল। সাম্বমূর্তি আমাদের জানান যে হরিপালদেব তাঁর সঙ্গীত-সুধাকর গ্রন্থে (আ. ১৩০৯-১৩১২) পারস্যপ্রভাবিত উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতকে হিন্দুস্তানী সঙ্গীত ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতকে কর্ণাটকী সঙ্গীত নামে অভিহিত করেন।^{২৭} অথও ভারতীয় সঙ্গীতের শেষ শাস্ত্রকার ছিলেন। তবে সঙ্গীতরত্নাকরে ‘তুরস্ক তোরি’ নামে একটি রাগের উল্লেখ আছে, যার থেকে মনে হয় বহিঃ ভারতের প্রভাব ভারতীয় সঙ্গীতে অনেক আগের থেকেই পড়েছিল। সাম্বমূর্তি বলেন, কর্ণাটকী সঙ্গীতের অর্থ দক্ষিণের সঙ্গীত এবং প্রাচীন সঙ্গীত। ‘কর্ণাটকী’ নামটি শ্রীমদ্ভাগবতম্ ও ভোজচম্পূতে পাওয়া যায়। দেশের জনরুচির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দেশি ধারাই বর্তমান ভারতীয় সংগীতে রূপান্তরিত হল। বর্তমানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতীয় সঙ্গীতের মেলবন্ধনের প্রয়াসটি উল্লেখযোগ্য আর তাও শুরু হয়েছে শ্রোতাদের রুচির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই।

ভারতবর্ষে সামগানের সঙ্গে সমান্তরালভাবে অবৈদিক লৌকিক ধারাও প্রচলিত ছিল। সেই সঙ্গীতের পরিশীলন না থাকলেও হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ততার অভাব ছিলনা। সেই ধারা ছিল সামবেদের থেকেও প্রাচীন। সেখান থেকেই নির্যাস নিয়ে যথাযথ পরিশীলন ও সংস্কারের মাধ্যমে সামগান ও গান্ধর্ব সমৃদ্ধ হয়েছে। সামের মধ্যে লৌকিক প্রভাবের ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সামগানের পূর্ববর্তী এই ধারার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সামগানকে তাই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সঙ্গীত না বলে নিয়মানুসারে নিবদ্ধ প্রাচীনতম সঙ্গীতের ঐতিহাসিক নিদর্শন বলা যেতে পারে।

Endnote:

- ১ কৌষীতকি ব্রাহ্মণ ২৯.৫
- ২ ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৩০.১
- ৩ 'যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা সা ঋক্' মীমাংসাসূত্র ২/৩৫
- ৪ গীতিষু সামাখ্যা, ঐ ২/৩৬
- ৫ শেষে যজুঃশব্দঃ, ঐ ২/৩৭
- ৬ M. Winternitz, History of Indian Literature, Vol I Part I p. 143-১৪৪
- ৭ ভিণ্টারনিত্স-কর্তৃক সংকলিত, ঐ, পৃ ১৪৩-১৪৪।
- ৮ Vedic Literature, p. 317
- ৯ সামবেদসংহিতা, পৃ.১৩
- ১০ জৈমিনীয়ব্রাহ্মণ ১.১২৪
- ১১ ছান্দোগ্য উপনিষদ ১.১৩
- ১২ M. Winternitz, পৃ ১৪৫
- ১৩ ঐ, পৃ ১৪৬
- ১৪ ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ২.৮.১,২;২.৯.২-৮
- ১৫ ঐ ২.১১.১
- ১৬ Louis Renou. Vedic India, p 19
- ১৭ p. XIV
- ১৮ আশ্বমেধিকপর্ব ৯৪.৪৩
- ১৯ বৃহদ্দেশী ১.২
- ২০ ঐ ১.১৪
- ২১ ঐ ১.১৫
- ২২ সংগীতরত্নাকর ১.২.২২
- ২৩ ঐ ১.১.২৩-২৪

- ২৪ অনাদিসম্প্রদায়ং যদ্ গন্ধর্বৈঃ সংপ্রযুক্ত্যতে ।
নিয়তং শ্রেয়সো হেতুস্তদ্ গান্ধর্বং জগদ্বুধাঃ ।।
যত্নে বাগ্গেয়কারণে রচিতং লক্ষণাশ্চিতম্ ।
দেশীরাগাদিষু প্রোক্তং তদগানং জনরঞ্জনকম্ ।। ঐ ৪.১.২-৩
- ২৫ ঐ ৪.৪
- ২৬ ঐ ৫.২৩০
- ২৭ 'By the time of the invasion by Malik Kafir in 1294 the North Indian music has become almost Persianised. This was called Hindustani Music by Haripala Deva and the music of South India was called Karnatic Music meaning southern music and old music.' P. Sambamoorthy, South Indian Music Vol I, The Indian Music Publishing House, Madras 1935, p 13.

Bibliography

- আগাশে, কাশিনাথ (সম্পাদিত)। ঐতরেয়ব্রাহ্মণ। পুণা ১৯৭৭
- বিশ্বাস, দীপ্তি। নারদীয়শিষ্কা, প্যাপিরাস। কলকাতা ২০০৫
- ভট্টাচার্য, হরিনারায়ণ। শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ, সংস্কৃত কলেজ। কলকাতা ১৯৭০
- মিত্র, রাজেশ্বর। বৈদিক ঐতিহ্যে সামগান, জিজ্ঞাসা। কলকাতা ১৯৭৮
- সত্যব্রত সামশ্রমী। সামবেদসংহিতা গানগ্রন্থসহ। নতুন দিল্লী ১৯৮৩ পুনর্মুদ্রণ।
- Gonda, Jan. Vedic Literature Vol. I Fasc. I of A History of Indian Literature. Weisbaden 1975
- Joshi, K.L. & Vedralankar, M.A. (ed). Nāṭyaśāstra of Bharatamuni with com. Of Abhinavagupta. Delhi 1984.
- Sharma, Premalata (ed). Bṛhaddeśī of Maṇḍamuni. IGNCA & MLBD. New Delhi 1992.
- Shringy, R.K. (ed). Saṅgītaratnākara of Śārṅgadeva. IGNCA. New Delhi Vol. I 1991, Vol.II 1989.
- Renou, Louis. 1971. Vedic India. Eng. Trans. By Phillip Spratt. Delhi.

- Rowell, Lewis. 1992. Music and Musical Thought. The University of Chicago Press, Chicago and London.
- Winternitz, M. 1962. History of Indian Literature Vol.I Part I. Calcutta. 3rd ed.

Bio Profile of the Author:

Retired Professor, Department of Sanskrit
University of Calcutta
Email: didhiti2017@gmail.com

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা ড. দীধিতি বিশ্বাস, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ঈশান স্কলার ও কৃতী ছাত্রী। “A Critical study of the Aranyakas” নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত তার পিএইচডি সন্দর্ভটি দেশে ও বিদেশে স্বীকৃত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি আরও তিনটি গ্রন্থ এবং প্রায় পঞ্চাশটি গবেষণা প্রবন্ধ নানাস্তরের গবেষণাপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তার বিভাগের প্রধানের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি দেশে ও বিদেশে বহু সারস্বত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছেন ও আমন্ত্রিত হয়েছেন। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের যন্ত্র-সঙ্গীত বিভাগের মিউজিকোলজির পঠন-পাঠনের সঙ্গে তিনি দীর্ঘদিন অতিথি শিক্ষক হিসেবে যুক্ত ছিলেন।

